জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০: একটি পর্যালোচনা

সপ্তক ভট্টাচার্য

১

২৯'শে জুলাই, ২০২০। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন পেল এক সম্পূর্ণ নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি। বদলে যেতে চলেছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো। অনেকের মতে, সিদ্ধান্তটি একদম সঠিক, এতে দেশের সামগ্রিক উন্নতিই হবে। অনেকেই আবার অবস্থান করছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। আমার মতে, দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমান ভারতবর্ষের সামগ্রিক রাজনৈতিক চিত্র ও আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষানীতি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে, তা তলিয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন। সেই উপলব্ধি থেকেই ভাবা, ও লেখা শুরু করা। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে শিক্ষানীতি বিষয়ক যা যা আলোচনা সম্ভব তার সবটুকু আমি এই লেখার মাধ্যমেই সেরে ফেলবো। তা কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। দুটি পর্বে সম্পন্ন হতে চলা এই প্রবন্ধটির প্রথম পর্বে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ ও আর্থসামাজিক বৈষম্যের কথা। পাশাপাশি থাকবে একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে পুঁজিবাদীদের অঙ্গুলিহেলনে চলে, তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। দ্বিতীয় পর্বে মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে ভাষাশিক্ষা। বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগের চিত্রটিও তুলে ধরার চেষ্টা করব এই প্রবন্ধের মাধ্যমে। আর পাঁচটি মানুষের মত আমারও রাজনৈতিক মতামত আছে কিছু, তাই 'আনবায়াসড্' বলতে সকলে যা বোঝে, নিজেকে ঠিক তেমনটি বলে দাবি আমি করতে পারি না। তবে চেষ্টা করব, পাঠক বা পাঠিকার উপর নিজের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে লেখাটি যথাসম্ভব আলোচনাধর্মী রাখার। আশা করি, আপনারা প্রশ্ন তুলবেন, কোথাও আমার কিছু বোঝার ভুল হয়েছে মনে করলে জানাবেন ইকারাস পত্রিকার ঠিকানায়, ব্যক্ত করবেন নিজের মতামত। সরকার নই, জেলে পুরব না।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির ভূমিকায় মোট দশটি পয়েন্টে আলোচনা করা হয়েছে ভারত ও বহির্বিশ্বের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞান শিক্ষা/গবেষণার প্রেক্ষাপট, এবং তার সাপেক্ষে দেশে নতুন এক শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা। এগুলি কিছু স্বতঃসিদ্ধ, যার উপর ভিত্তি করে নীতি নির্ধারণকারী পদক্ষেপগুলির উপযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই ভূমিকার লেখনী তাই হওয়া উচিত ছিল তথ্যনির্ভর, যা ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবিক ত্রুটিসমূহ এবং তার সামাজিক প্রভাবগুলি তুলে ধরতে সক্ষম হত। অথচ ঠিক এই জায়গায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে লেখার ভাষায় তথ্য ও বিজ্ঞানমনস্কতা কম, জাতীয়তাবাদ ও ভাবাবেগ বেশি।

উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় পয়েন্টে আছে,

> With the rise of big data, machine learning, and artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines, while the need for skilled labour, particularly involving mathematics, computer science and data science, in conjunction with multi-disciplinary abilities across the sciences, social sciences and humanities, will be in rapidly increasing demand. With climate change and rapid depletion of natural resources, there will be a sizable shift in how we meet the world's energy, water, and sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labour, particularly in biology,chemistry, physics, and climate science. There will be a growing demand for humanities and art, as India moves towards becoming a developed country and among the top three economies of the world.

এহেন স্বপ্নালু ভাবপ্রবণতা শুনতে হয়তো ভালোই লাগতে পারে, কিন্তু বাস্তবটা কী? ঠিক কোন্ হিসেবে ভারতবর্ষ এক উন্নত দেশ হওয়ার দিকে এগোচ্ছে? একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে শহরাঞ্চলের উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সচরাচর তার ফেসবুকীয় নেশাগ্রস্ত চোখে যে ভারতবর্ষকে দেখে, যে ভারতবর্ষের নিবাসী হতে পেরে সে জাতীয়তাবাদী গর্ববোধে মজে, সেই ভারতবর্ষের কথাই স্থান পেয়েছে উপরোক্ত পয়েন্টগুলিতে। যা স্থান পায়নি, তা হল ভারতবর্ষের শ্রম ও শ্রমিক আদতে পরিচালিত হয় এক বটবৃক্ষসম সিস্টেমের দ্বারা, যার শিকড় প্রোথিত আছে সমাজের অতল গভীরে। জাতিভেদ, লিঙ্গবৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ইত্যাদি হয়ে আছে তার হৃষ্টপুষ্ট ডালপালা। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পয়ঃপ্রণালী সাফাইকর্মীদের কথা, যাঁদের কাজকে পোষাকি ভাষায় ম্যানুয়্যাল স্ক্যাভেঞ্জিং বলে। এহেন চরম বৈষম্যমূলক মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী প্রথা বোধহয় দেশে আর নেই। যে মানুষগুলি এ কাজ করতে বাধ্য হন, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখে অচ্ছুৎ, সমাজে তাঁদের স্থান সর্বনিম্নে। আইনি বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এ প্রথার অবসান তো বিন্দুমাত্র হয়ইনি, বরং বিস্তার ঘটেছে আরও। শুধুমাত্র সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে মৃত্যু হয়েছে ১১০ জনের। সংখ্যাটি তার আগের বছরের চেয়ে ৬১% বেশি। এবছরের ৩১'শে জানুয়ারি অবধি পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে এইমুহূর্তে ম্যানুয়্যাল স্ক্যাভেঞ্জারের সংখ্যা ৪৮ হাজারের কিছু বেশি। তার মধ্যে সর্বাধিক, ২৯৯২৩ জন, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে এই বিষয়ে জানতে পেরেছি'। শিক্ষার অধিকার তো দুরঅস্ত, মানুষের মত করে জীবনযাপনের অধিকারটুকুও যাঁদের নেই, তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই "...need for skilled labour in Biology, Chemistry, Physics and Climate Science" বা "...as India moves towards becoming a developed country"-র মতো শব্দবন্ধগুলি খুব একটা তৃপ্তিদায়ক হবে কি? জানি, এ পর্যন্ত পড়ে অনেকেই আমাকে বোঝাবেন কী করে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এই শ্রেণীবৈষম্যগুলি মুছে যেতে চলেছে। তাঁদের

উদ্দেশ্যে বলব, জাতিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্য মুছে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হলে ভূমিকায় সেই বিষয়ে সবিস্তারে কিছু কথা খরচ করতে হত। দায়সারাভাবে একবার "The aim must be for India to have an education system that ensures equitable access to the highest-quality education for all learners regardless of social and economic background. To achieve this, actions must be taken now and with urgency" বলে দেওয়ার চাইতে কিছুটা বেশিই আলোকপাত করতে হত শিক্ষার উপর জাতিভেদ ও আর্থিক বৈষম্যের প্রভাব ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়ে। করা হয়নি। যা হয়েছে, তাকে সহজ ভাষায় 'সত্য গোপন' বলে। ভারতবর্ষে দারিদ্রসীমার নিচে জন্মানো শিশুদের মধ্যে অর্ধেকই দলিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই কখনো স্কুলে যাওয়া হয়ে ওঠেনা। যাঁদের হয়, তাঁদের মধ্যে অনেককেই বাধ্য হয়ে স্কুল ছাড়তে হয়, হতে হয় শিশুশ্রমিক। মেয়ে হয়ে জন্মালে দারিদ্র্য ও শ্রেণীবৈষম্যের পাশাপাশি মুখোমুখি হতে হয় বর্তমান ভারত তথা বিশ্ব-সমাজব্যবস্থার কদর্যতম বিকার, পিতৃতন্ত্রের। ভারতবর্ষে সর্বমোট ২৭% মেয়ের বিয়ে হয় আঠারো বছরের আগে। ২০১৮ সালে ন্যাশানল জিওগ্রাফিকের হয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন নিনা স্ট্রকলিচ। সেখানে ফটোজার্নালিস্ট সৌম্য খান্ডেলওয়ালের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন উত্তর ভারতের শ্রাবস্তী অঞ্চলের মেয়েদের কথা। তথ্য হিসেবে যা উঠে আসে, তা ভয়াবহ। আঠারোর নিচে তো বটেই, বহু ক্ষেত্রে আট বছরের বালিকাদেরও বিয়ে দেওয়ার চল আছে সে অঞ্চলের পরিবারগুলির মধ্যে। গড়ে সেখানকার একটি মেয়ে নিজের জীবনে পাঁচবার মা হয়।

সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর পাশাপাশি নির্মম দারিদ্র্য এবং অশিক্ষাও এই সমস্তকিছুর জন্য দায়ী। ভাবানুবাদ না করে সে প্রবন্ধটিরই একটি অংশ তুলে দিচ্ছি, পাঠক বা পাঠিকার কাছে অনুরোধ রাখব, নিজেই বিচার করুন:

> When Khandelwal decided to turn her camera on these girls, she expected tradition and patriarchy to dominate each family's decision to marry off their daughters. What she found was a practice also rooted in poverty, a lack of education, and the volatility of life. In Shravasti, Khandelwal asked the mother of a young bride who had also been married as child: Why are you subjecting your daughter to the same fate? The mother replied that she'd prefer not to, but there were few other options. Her husband was a day laborer and she and her children gathered and sold firewood. They lived day to day, so it was better to marry off their girls before outside forces intervened. 'If we lose our house to floods tomorrow, we won't have anything to give for our daughter's wedding dowry,' she said.[২]

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তার সামাজিক মানচিত্র। অথচ যখন খোলনলচে পাল্টে ফেলা হয় দেশের শিক্ষানীতির, তখন দেখা যায় সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িতরা সেখানে ব্রাত্য। সরকারি তরফে স্বীকারও করা হয়না তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা।

সমস্ত আলোচনার মূলে থাকে কিছু ভুল স্বতঃসিদ্ধ, যার উপর ভিত্তি করে প্রিভিলেজের চশমা-আঁটা চোখে আমরা দেখি সুফল, খুঁজে নিই সঙ্গীত আর পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে একসাথে পড়ার সুযোগ। প্রদীপের নীচের অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। একটি আদর্শ শিক্ষানীতির মাধ্যমে সরকারের দায়িত্ব শুধু সমাজের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন বাস্তবতাকে স্বীকার করা নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিসম্মত উপায়ের মাধ্যমে সেই অন্ধকার দূরীকরণে ব্রতী হওয়া। আমরা দেখেছি, বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয়নি। কোনোরকম তথ্য ছাড়া ভারতবর্ষের একটি ফোলানো-ফাঁপানো খোলস জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে কী তবে প্রাধান্য পেতে চলেছে? ড্রাফ্টের সাত নম্বর পয়েন্টে চোখ রাখলে আমরা দেখব, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবদানের কথা অতি বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে এও বলা হয়েছে যে,

> These rich legacies to world heritage must not only be nurtured and preserved for posterity but also researched, enhanced and put to new uses through our education system. For instance, they can be integrated into a holistic education to help develop the creativity and originality of students and to encourage them to innovate.

বেশ। তার মানে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবদানের কথা পাঠ্যক্রমে থাকবে, তাই নিয়ে গবেষণাও হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রাচীন ভারতে সভ্যতা ছিল, অস্বীকার করিনা। বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চায় ভারতীয়রা অগ্রসর ছিল, তাও অস্বীকার করিনা। কিন্তু কতটা? বাস্তবে তারা কী অবস্থায় ছিল না ছিল, এই নিয়ে আদৌ কোনো বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আমরা হতে দেখি চারপাশে? পাঠ্যক্রমে কী আসতে চলেছে, বা গবেষণা কী নিয়ে হতে চলেছে তার কিঞ্চিৎ আভাস গত কয়েক বছরে সরকারের নেতা-মন্ত্রী এবং তাঁদের ধামাধারী বিজ্ঞানীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেই পাওয়া যায়। ২০১৯ সালের জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়নবিদ্ জি. নাগেশ্বর রাও, যিনি বর্তমানে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মহাভারতের উদাহরণ তুলে দাবি করেন গান্ধারীর শতপুত্রের জন্ম দেওয়া (স্বাভাবিকভাবেই দুঃশলার নাম উল্লেখ করেননি, কন্যাসন্তান কিনা!) নাকি প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানীদের স্টেম-সেল গবেষণায় সাফল্যের প্রমাণ। তার আগের বছরই বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. হর্ষ বর্ধন দাবি করেন, বেদে লেখা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গুরুত্ব আইনস্টাইনের যুগান্তকারী ভর-শক্তি সমানতা সূত্রের থেকে বেশি, যে প্রসঙ্গে রসায়নে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. বেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণন বলেছিলেন,

> It's one thing for a crackpot to say something like that, but a very bad example for people in authority to do so, it is deplorable.

শুধু তাই নয়, ২০১৭ সালে এই ব্যক্তিই আইআইটিগুলিতে গোময় ও গোমূত্রের ঔষধি গুণ সংক্রান্ত গবেষণা করার অনুমতি দেন, সম্পূর্ণ সরকারি খরচে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এহেন লাগাতার অযৌক্তিক অপবিজ্ঞান প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাভাবনাভুলিয়ে তাদের মনে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করা। আশঙ্কাটি নেহাত অমূলক নয়। ২০১৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং বলে বসেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ মিথ্যা

এবং তা পাঠ্যক্রম থেকে সরানো দরকার, কারণ কেউ নাকি কখনো বানরকে মানুষে রূপান্তরিত হতে দেখেনি। এহেন মন্তব্য হাস্যকর মনে হতে পারে অনেকের কাছে, কিন্তু অতীতের ঘটনাক্রম মাথায় রেখে বর্তমানে পরিবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতির উপর একবার চোখ বোলানোর পর ঠোঁটের হাসির চাইতে কপালের চিন্তার ভাঁজ বেশি দৃশ্যমান হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেই মনে করি।

লেখাটি যখন শুরু করেছিলাম, ভেবেছিলাম স্কুলশিক্ষার কাঠামো বদল এবং সাধারণ মানুষের উপর তার সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই প্রথম পর্বেই সারব। তেমনটা ঠিক হল না, শিক্ষানীতির ভূমিকা ও তার সমালোচনা নিয়েই চলে গেল অনেকটা সময়। তবে এটি অপ্রয়োজনীয় কিছু বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করিনা, কেননা উপন্যাস আর সরকারি নীতির মধ্যে কিছু বিশেষ পার্থক্য আছে। একটি সরকারি নীতির ভূমিকায় ফুটে ওঠে সরকারের সার্বিক চিন্তাধারা ও উদ্দেশ্য। ফুটে ওঠে, ঠিক কোন্ কোন্ যুক্তিতে বিশ্বাস রেখে সেই নীতি নির্ধারণের দিকে পা বাড়িয়েছে সরকার। তাই যে কোনো সরকারি নীতির, বিশেষত শিক্ষার মত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে, গঠনমূলক সমালোচনা করতে গেলে আগে তার ভূমিকা নিয়ে কিঞ্চিৎ কাটাছেঁড়া করতেই হয়। যাই হোক, সময় এসেছে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার যা যেকোনো সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও ভারতের ক্ষেত্রে ব্রাত্য— লিঙ্গ সংবেদনশীলতা ও যৌনশিক্ষা। বস্তুত, এই ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে যে ছুঁৎমার্গের 'সংস্কৃতি' চলে এসেছে, তা দেশের বহু গুরুতর সামাজিক ব্যাধির মূল কারণ বললে ভুল হবেনা। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সচারচর পুত্রসন্তানের বড় হয়ে ওঠার পথে তাকে দেওয়া হয় 'পৌরুষ'-এর পাঠ। যথার্থ 'পুরুষসিংহ' গড়ে তোলার তাগিদে তাকে শেখানো হয় বলপ্রয়োগ করে নিজের 'অধিকার' ছিনিয়ে নিতে। শুধু তাই নয়, সার্বিকভাবে সমাজ নারীকে দেখে পুরুষের সম্পত্তিরূপে, মনে করে তার আচার-আচরণে লজ্জা, কুণ্ঠা, আনুগত্য ইত্যাদি 'ভালো মেয়ে'-সুলভ গুণ থাকা আবশ্যক। এই সমস্ত প্রোটোটাইপের ছাঁচে যে নারীকে সমাজ ফেলতে পারে না, সে কোনোরকম যৌন হেনস্থার শিকার হলে সমাজ দোষ খুঁজে বেড়ায় তার পোশাকে বা ব্যবহারে। 'ধর্ষণ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণস্বরূপ। দেখবেন, ক্রিকেটে ভারত তার প্রতিপক্ষকে হারালে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ গর্বভরে লিখছে, 'উই রেপড দেম'। শুধু কি তাই? যে কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধমত পোষণকারিনীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে বন্ধুমহলে 'নিছক' গালাগালি হিসেবে মহিলাদের নিয়ে চরম আপত্তিকর শব্দবন্ধের ব্যবহার, এই সমস্তকিছুর মধ্যে দিয়েই কি ফুটে ওঠে না আমাদের দেশের ধর্ষণ সংস্কৃতি? এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সবার আগে সমস্যার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে স্কুলগুলিতে যৌনশিক্ষার ক্লাস বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। শুধু নিয়মে বদল আনলেই চলবে না, তার প্রয়োগে নুন্যতম গড়িমসিও যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শুধু স্কুলস্তরে নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও নিয়মিত করতে হবে লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা বিষয়ক ওয়ার্কশপ। বোঝাতে হবে সম্পর্কে কনসেন্টের গুরুত্ব। 'Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights'-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী,

> Most schools, private and public affiliated state boards of secondary education don't have any form of sexuality

education in their curriculum.

২০০৭ সালে ইউনিসেফ এবং ভারত সরকারের উদ্‌যোগে স্কুলস্তরে 'Adolescent Education Programme' বা AEP চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়, যেটি তৎকালীন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মতে,

> ...aimed to empower young people with accurate, age appropriate and culturally relevant information, promote healthy attitudes and develop skills to enable them to respond to real life situations in positive ways.

লিঙ্গ এবং যৌনতা সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার কথা সেখানে বলা থাকলেও প্রোগ্রামটির নিজস্ব কিছু বড় খামতি ছিল। যেমন 'কনসেন্ট' বিষয়টি সেখানে একেবারেই স্থান পায়নি[৩]। কিন্তু তারপর আমরা কী দেখি? যে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি বাদ গেছে সেগুলিকে স্থান দেওয়ার দাবিতে বিরোধীপক্ষের আন্দোলন? একেবারেই না। বরং বারোটি রাজ্য সরকার এই AEP-কে নিজেদের স্কুলশিক্ষার পাঠ্যক্রমে ব্যবহার করতে সরাসরি অস্বীকার করে, কেননা এতে নাকি এমন কিছু 'inappropriate content' আছে যার প্রভাবে ছাত্রছাত্রীরা বিপথগামী হতে পারে! অবশ্য গোঁড়া মধ্যযুগীয় সংস্কারসমূহের ধারক ও বাহকরা ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করলে এমনটাই হওয়ার কথা। কিন্তু সরকার যখন সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কাঠামো, এবং দাবি করে এতে দেশ ও দশের অশেষ মঙ্গলসাধন হবে, তখন যৌনশিক্ষা এবং লিঙ্গ সংবেদনশীলতার মতো বিষয়গুলি এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা সেখানে সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত হয়েই থেকে যায় কেন?

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে তাহলে? উত্তর ভূমিকাতেই পাবেন। শিক্ষানীতি বদলের প্রধান কারণ হিসেবে যা দর্শানো হয়েছে, যাকে বলা যেতে পারে "the sole driving force prompting the change", তা হল বিশ্বায়ন। সোজা কথায়, মুক্ত অর্থনীতির বাজারে যখন পণ্যায়নের করাল গ্রাসে ঢাকা পড়েছে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, পাহাড় থেকে জঙ্গল, তখন কর্পোরেটের চাই দৈহিক ও মানসিক শ্রমের অফুরন্ত যোগান। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টানোর মাধ্যমে আগামী দিনের ছাত্রছাত্রীদের কর্পোরেটের 'মডেল' শ্রমিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যে জন্য ১১ বছর বয়সে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এবং বিভিন্নরকম ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'computational and mathematical skills'- 'Skilled labour in biology, chemistry and Physics'-এর 'প্রয়োজনীয়তা'-র কথা। স্কুলশিক্ষার এই ৫+৩+৩+৪ মডেলে বর্তমানে অষ্টম শ্রেণীর সমতুল্য স্তর অবধি পড়ার পর ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে আগামী চার বছরের জন্য পছন্দের বিষয় বেছে নেওয়ার সুযোগ। শুনে খুশি অনেকেই, জানি। পরিবারের পক্ষ থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বিষয়সমষ্টি না নিয়ে একজন ছাত্রী বা ছাত্র নিজের ইচ্ছেমত বাছতে পারবে বিষয়, নিতে পারবে ফিজিক্সের সাথে সঙ্গীতবিদ্যা, এ খবর জেনে উচ্ছ্বসিত অনেকেই। তাঁরা এটা ভাবছেন না যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা সমাজের প্রিভিলেজড শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি। এতে তাঁদের দোষ নেই অবশ্য। দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে সিস্টেম্যাটিক্যালি এই শ্রেণীটিকে আলাদা করে রাখা হয়েছে দেশের বাকি মানুষগুলির থেকে, গড়ে তোলা হয়েছে social divide, তাতে এমনটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। না হলে তাঁরা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলতেন,

দেশের ঠিক কত শতাংশ মানুষের হাতে এই সুবিধাটুকু আছে, যাতে তাঁদের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ঐচ্ছিক বিষয়চয়নের বিলাসিতাটুকু দেখানো সম্ভব? কতজনের আছে সেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা? উত্তরটা আশাকরি আপনার জানা। চরম বেকারত্বের জ্বালায় সরকারি স্কুলগুলির বহু ছাত্রছাত্রী চাইবে যেনতেন প্রকারে একটি চাকরি পেতে। এইখানে আসছে কর্পোরেটের কথা। তাদের কবলে থাকা এই প্রযুক্তিচালিত দুনিয়ায় চাকরি পেতে গেলে আপনাকে ঠিক কোন্ কোন্ বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে? উত্তরটা নিশ্চয়ই 'স্বর্ণযুগের বাংলা গদ্যসাহিত্য' বা 'অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতা' নয়? সুতরাং বিষয়চয়ন যেখানে ঐচ্ছিক, সেখানে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা যে ফিজিক্সের সাথে সঙ্গীতবিদ্যা বা কেমিস্ট্রির সাথে সমাজবিজ্ঞান নেবে না কোনোদিন, সেটা আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। জোর দেওয়া হবে শুধু সেই সমস্ত বিষয়গুলির উপর, যেগুলির বাজারে চাহিদা আছে। তাছাড়া ১৪ বছর বয়সে ইচ্ছামত বিষয় বেছে নেওয়ার মতো পরিণত মানসিকতা ক'জনের থাকে? সেখানে parental guidance কি একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে না? এখন আমাদের দেশে যাঁরা সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে নিম্নে অবস্থান করেন, যাঁদের কাছে পৌঁছয়নি উচ্চশিক্ষার স্পর্শ, তাঁদের পক্ষে সন্তানকে সেই গাইডেন্স দেওয়া বস্তুত অসম্ভব। সুতরাং সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কী পরিণতি হবে? স্বাভাবিকভাবেই, বাজারচলতি কনসেপ্ট তাদের উপর সমষ্টিগতভাবে চাপিয়ে দেওয়াটা অনেক সহজ হবে কর্পোরেট ও তাদের সহায়কদের পক্ষে। সেই বাজারচলতি ধারণায় সবকিছু সংঘটিত হবে 'demand and supply' নিয়মে। স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়গুলির demand থাকবে না, তাই সেসব নিয়ে কেউ পড়বেও না, বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলির মূল্য এসে ঠেকবে শুধু প্রযুক্তির ব্যবহার জানা শ্রমিকের যোগান দেওয়াতে, ঠিক যে ঘটনাটা ঘটে চলেছে পুঁজিবাদের পীঠস্থান মার্কিন মুলুকে। স্কুলে কলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পর্যাপ্ত বেতন পান না, প্রায়ই বিভিন্ন পার্ট-টাইম জব করে জীবিকানির্বাহ করেন। সেদেশের National Centre for Education Statistics-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে সর্বমোট স্নাতকের সংখ্যা ১৯,২০,৭১৮ যা তার দশ বছর আগেকার সংখ্যার থেকে ২৯% বেশি। কিন্তু এই বৃদ্ধি হয়েছে ঠিক কোন্ বিষয়গুলিতে? চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। হিউম্যানিটিজ বিষয়গুলির মধ্যে স্নাতকের সংখ্যার হ্রাস চোখে পড়ার মতো। Education-এ ১৯%, ইংরাজি সাহিত্যে ২২% এবং দর্শনে ১৫% হ্রাস পেয়েছে স্নাতকের সংখ্যা। তাহলে বেড়েছে কোথায়? স্বাস্থ্যপরিসেবায় (যা আমেরিকায় পুরোপুরি কর্পোরেটের দখলে) স্নাতকের সংখ্যা এক দশকে বৃদ্ধি ঘটেছে ১০০%-এরও বেশি, ৯১,৯৭৩ থেকে ২,২৮,৮৯৬। এছাড়াও জাতীয় সুরক্ষা এবং আইন প্রণয়ন বিভাগে ৭৩%, যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ৬২%, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০%, গণিত এবং পরিসংখ্যানবিদ্যায় ৫৪% এবং পদার্থবিজ্ঞানে ৪৯% বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণাও এখন পুরোপুরি পুঁজিবাদীদের হাতে। কর্পোরেট লবি বোঝে ব্যবসা, কোনো বিজ্ঞানী এবং তাঁর রিসার্চ গ্রুপের সদস্যরা যদি মানবকল্যাণস্বার্থে কোনো আবিষ্কার করে ফেলেন, এই কর্পোরেট লবি চেষ্টা করে তা জনসমক্ষে না আনতে, পাছে তাদের ফুলেফেঁপে ওঠা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়! মনে রাখবেন, আমেরিকার স্কুলশিক্ষানীতিও কিন্তু ভারতবর্ষের এই নয়া শিক্ষানীতির মতো 'চয়েস'-এর ভার দিচ্ছে পড়ুয়াদের উপর। তথ্যই

বলে দিচ্ছে, উন্নতি কতটা হচ্ছে। আসলে এই চয়েসের নীতি তখনই সফল হতে পারে যখন দেশের প্রতিটি নাগরিক পায় সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার সুবিধা, যখন জীবিকানির্বাহের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়না অতি অল্প বয়সে, যখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলি পণ্য হিসেবে নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখা হয়, যখন অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি হয় জনকল্যানমূলক। আপাদমস্তক পুঁজিবাদের কবলে চলে যাওয়া দেশে এহেন শিক্ষানীতির প্রণয়ন সর্বনাশ ডেকে আনে, রাষ্ট্রের তরফে এ কাজ করাও হয় সেই স্বার্থেই। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই মাধ্যমিক স্তরের পর আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননা, বাধ্য হয়ে কোনো সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজ খোঁজার চেষ্টা করেন, যা চরম উদ্বেগজনক। সরকারি চাকরির হাল তথৈবচ, দশক কেটে যায় তবু শূন্যপদ ভরাট হয়না। সুতরাং বেশিরভাগ সময়েই তাঁরা নিযুক্ত হন বেসরকারি ক্ষেত্রে, মুক্ত উদারনীতির কারণে যেখানে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। নয়া শিক্ষানীতিতে ১১-১৪ বছরের আপার প্রাইমারি স্টেজের পর এই ছাত্রছাত্রীরাই স্কুলছুট হলে তারা পূর্বপ্রাপ্ত ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের কারণে হয়ে উঠবে কর্পোরেটের অধীনস্থ শ্রমিক, প্রায়শই স্বল্প বেতনের। এছাড়া ভেবে দেখুন, শহুরে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা সন্তানকে প্রাইভেট স্কুলে পড়ানোর ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিন্তু এই শিক্ষানীতি বড় সুবিধাজনক। তাঁদের সন্তানরাও এই শিক্ষাব্যবস্থার গুণগান করে চলবে, ইচ্ছেমত কম্বিনেশন বেছে নেওয়ার মধ্যে খুঁজে পাবে অবাধ স্বাধীনতা। তাঁরা যে বাস্তবে আসল ভারতবর্ষ থেকে কতটা দুরে সরে যাচ্ছেন, তা বুঝতেও পারবেন না। এভাবেই বেড়ে চলবে social divide, তীব্র বৈষম্য ক্রমে মানুষকে করে তুলবে অন্ধ ও অসংবেদনশীল। তার সাথে বর্তমান শাসক দলের উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি যোগ করলে দেখবেন, দেশজোড়া অবিশ্বাস আর ধর্মান্ধতার বাতাবরণে মানুষের হাতে মরছে মানুষ, আর ঠোঁটে অন্তর্যামীসুলভ হাসি নিয়ে দেশকে নিংড়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিচ্ছে সরকারি মদতপুষ্ট পুঁজিপতিরা।

২

নয়া শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত প্রবন্ধটির দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব এখন লিখতে চলেছি। এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসাবে প্রধানত থাকবে ভাষাশিক্ষা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং তার প্রভাবস্বরূপ কী লক্ষ্য করা গেছে, তাই নিয়ে যতটা সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা এখানে সারব। আমরা মধ্যবিত্তরা বড্ড সহজে পড়ে যাই বাইনারির ফাঁদে। একটি আগ্রাসনের জবাব হিসাবে অপর একটির পক্ষ নিতে দেরি করি না তাই বিন্দুমাত্র। ভাষা, ধর্ম, পার্টিভিত্তিক রাজনীতি, সব ক্ষেত্রেই এ কথা সমান প্রযোজ্য। চেষ্টা করব, যথাসম্ভব বাইনারির উর্ধ্বে উঠে আলোচ্য বিষয়গুলি কাটাছেঁড়া করে দেখার। পাঠক-পাঠিকার কাছে আবারও অনুরোধ, এ প্রচেষ্টায় কোথাও যদি ভুল হয়ে থাকে, নিজগুণে মার্জনা করবেন এবং খোলাখুলিভাবে জানাবেন আমাদের ইকারাস পত্রিকার ঠিকানায়।

ভাষাশিক্ষার বিষয়টি যখন উঠে আসে, আমরা পড়ে যাই এমন কিছু সূক্ষ্ম দ্বৈতের ফাঁদে, যাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ভারতবর্ষ নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশ বলে ছোটবেলা থেকে শিখে এলেও বড় বয়সে এসে "দেশের পরিচিতি তার ভাষা, জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় এক-ভাষা দিয়ে হবে না কেন?" বলে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার পক্ষে

সওয়াল করে ফেলি। অস্বাভাবিক নয়। দেশ-ভারতবর্ষ আর ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে তফাত করতে শেখানো হয়নি আমাদের। হয়নি বলেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে (এখানে যেমন ভাষা) রাষ্ট্রের ইচ্ছাকেই দেশ ও দশের ইচ্ছা বলে মেনে নিতে এতটুকু দেরি করিনা আমরা। অপর প্রান্তে আবার এমন কিছু মানুষজন আছেন, যাঁরা এই দলের আগ্রাসনের প্রতিকার হিসেবে রাজ্যস্তরে একটি মাত্র ভাষা ধরে গড়ে তুলতে চান প্রাদেশিক জাতীয়তাবাদের প্রাচীর। সেখানেও সমস্যা, কেননা একটি রাজ্যের সকল মানুষের ভাষাও এক না। সুতরাং ভাষা দিয়ে রাজ্যের পরিচিতি গড়ে তোলার তাগিদে তাঁরা বাস্তবে সেই কাজটিই করে চলেছেন যেটির বিরোধিতা তাঁরা জাতীয় স্তরে করে থাকেন।

ভারতবর্ষে ভাষাশিক্ষা-বিষয়ক কোনো কিছু লেখার আগে বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করি। ইংল্যান্ড, জার্মানি-সহ ইউরোপীয় দেশগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়স্তরে দুটি ভাষা শিখতে হয়, প্রাথমিক স্তরে একটি এবং মাধ্যমিকস্তরে আরেকটি। দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজির পাশাপাশি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্প্যানিশ বা ফরাসির মতো ভাষা শেখানো হয়ে থাকে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই স্কুলস্তরে ছেলেমেয়েদের শিখতে হয় বড়জোর দুটি ভাষা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংখ্যাটি তিন, কেননা একজন ছাত্রী বা ছাত্রের মাতৃভাষা রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত না হলে তা বড় সহজে বাদ পড়ে যায় পাঠ্যক্রম থেকে। সেক্ষেত্রে, শিক্ষার গোড়া থেকেই তাকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ নিতে হয় এমন একটি ভাষায়, যা বহুক্ষেত্রেই তার পরিবারের কাছে বিজাতীয়। ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এই কারণে ছোটবেলা থেকেই পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে। বর্ণবাদী ভারতীয় সমাজে লিঙ্গবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং আর্থিক অনটনের পাশাপাশি ভাষাশিক্ষার এই চাপের সাথে মানিয়ে নিতে না পারার কারণেও ছেলেমেয়েরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। এমন বিবিধ কারণে শিক্ষার মানেও পতন লক্ষ্য করা যায় চোখে পড়ার মত। ২০০৯ সালের Right To Education Act-এর জন্য সংখ্যার বিচারে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী কমলেও দেখা গেছে সার্বিকভাবে অর্জিত শিক্ষার মান নিম্নমুখী। ২০১৮ সালে দেশের ৫৯৬ জেলায় তিন থেকে ষোলো বছর বয়সের ৫,৪৬,৫২৭ ছাত্রছাত্রীর উপর চালানো হয় 'Annual Status of Education Report' নামক সমীক্ষা। যা তথ্য উঠে আসে, তা কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। দশ থেকে এগারো বছর বয়সী পঞ্চম শ্রেণীর স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে মাত্র ৫১% সঠিকভাবে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবই (যা বাস্তবে ৭-৮ বছরের পড়ুয়াদের পক্ষে উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়) পড়তে সক্ষম। অথচ ২০০৮ সালের ASER সমীক্ষা অনুযায়ী এই একই কাজে সক্ষম ছিল ৫৬% স্কুলপড়ুয়া। গণিতের ক্ষেত্রেও একইরকম। দেখা যায়, পঞ্চম শ্রেণীর স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে মাত্র ২৮% সঠিকভাবে ভাগ করতে সক্ষম। ২০০৮ সালে সংখ্যাটি ছিল ৩৭%। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও এই বিষয়ে আকাশপাতাল তফাত লক্ষ্য করা যায়। কেরলে প্রায় ৬৭% পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যবই পড়তে সক্ষম হলেও ঝাড়খণ্ডে সংখ্যাটি এসে দাঁড়ায় ৩৪%-এ। এছাড়াও ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসাম্যের কথা। ২০০৮ সালে সরকারি স্কুলের ৫৩% পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বই পড়তে পারে, সেখানে বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি বেড়ে হয় ৬৮%। এই ১৫% ব্যবধানটিই ২০১৮ সালে চওড়া হয়ে দাঁড়ায় ২১%-এ[৪]। ভুললে চলবে

না, দেশের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের ভরসা কিন্তু সেই সরকারি বিদ্যালয়। কাজেই এহেন অসাম্যের ছবির উঠে আসা বাস্তবে ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যবধানকেই তুলে ধরছে। অথচ বাড়ছে সাক্ষরতার হার। আর আমরা শুধুমাত্র সেটুকু দেখেই ধরে নিচ্ছি, দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে, বাস্তব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা রাখার চেষ্টা না করে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা চিরকালই তিনটি ভাষা পড়ানোর এই নীতির মাধ্যমে গড়ে তুলতে চেয়েছে হিন্দি-অহিন্দি বিভাজনের প্রাচীর। ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে University Education Commission প্রথম তোলে এই নীতি প্রণয়নের প্রসঙ্গ। হিন্দি যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা নয়, এবং সমৃদ্ধির দিক দিয়েও বাংলা, মরাঠি, তামিল-সহ বহুসংখ্যক ভারতীয় ভাষার পিছনে, এ কথা স্বীকার করলেও তারা দাবি করে, ভবিষ্যতে সমস্ত আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ হিন্দির মাধ্যমেই করা সম্ভবপর হবে, অর্থাৎ হিন্দি হয়ে উঠবে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের উপযুক্ত একটি লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ। এই নীতির প্রধান বক্তব্য হল, স্কুলস্তরে তিনটি ভাষার শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রথম ভাষা হিসেবে থাকবে একটি আঞ্চলিক ভাষা, যা একজন ছাত্রী বা ছাত্রের মাতৃভাষা হতে পারে। হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষাটি ইংরেজি, অথবা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। অথচ হিন্দিভাষী নয় এমন রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সেটি হিন্দি অথবা ইংরেজিই হতে হবে। তৃতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা, এমন একটি ভাষা ছাত্রছাত্রীদের শিখতে হবে যেটি তাদের দ্বিতীয় ভাষা নয়। হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ছেলেমেয়েদের হাতে এখানে অপর একটি ভারতীয় ভাষা শেখার সুযোগ থাকছে, কিন্তু বাকি রাজ্যগুলির স্কুলপড়ুয়াদের কাছে থাকছে শুধুমাত্র হিন্দি অথবা ইংরেজি শেখার সুযোগ, কাজেই হয় দ্বিতীয় আর নয়তো তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি তাদের শিখতেই হচ্ছে। ২০১৬ সালের সুব্রমণ্যম কমিটির রিপোর্ট, যার উপর ভিত্তি করা নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মূল খসড়াটি(কস্তুরীরঙ্গন ড্রাফ্ট) প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাতে তুলে ধরা হয়েছিল ঠিক এই বিষয়টিই। স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল,

> Under the TLF, every child is expected to learn three languages, namely the mother-tongue, Hindi and English. In Hindi speaking states, children are to be taught Hindi, English and one of the Modern Indian Languages.

বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্ট। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বানানো নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মূল খসড়ায় স্কুলস্তরে তিনটি ভাষার উপর জোর দেওয়ার কথা তো ছিলই, সাথে ছিল সরাসরিভাবে অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির উপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। যদিও বিষয়টিকে 'flexibility in the choice of languages'-এর বাহারি শীর্ষকের নিচে ফেলা হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়,

> In keeping with the principle of flexibility, students who wish to change one of the three languages they are studying may do so in Grade 6, so long as the study of three languages by students in the Hindi-speaking states would continue to include Hindi and English and one of the modern Indian languages from other parts of India, while the study of languages by students in the non-Hindi-

speaking states would include the regional language, Hindi and English.

বিষয়টি দক্ষিণের রাজ্যগুলি একেবারেই ভালভাবে নেয়নি। হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ভারতে ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে। ১৯৬৫ সালেও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি হিন্দিকে একমাত্র জাতীয় ভাষা ঘোষণা করার বিরোধিতা করে। বিরোধ শুধু ভাষার জন্য নয়, সেই ভাষার সাথে সাথে উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ের সংস্কৃতি অন্যান্য প্রদেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া আটকানোর জন্য। বর্তমানে দেশের শাসনক্ষমতায় থাকা উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষিতভাবে এক ধর্ম, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির ভিত্তিতে দেশ গড়ার (পড়ুন ভাঙার) পক্ষপাতী, এটুকুই যা তফাত। দেশের ভাষাগত মানচিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা কারোরই নেই। ২০১১ সালের জনগণনায় তথ্য বিকৃত করে হিন্দিকে প্রায় ৫২ কোটি ভারতবাসীর মাতৃভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অথচ তার মধ্যে বিহার, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, হরিয়ানা, ছত্তিশগঢ় এবং ঝাড়খন্ডের অধিবাসী মিলিয়ে প্রায় ৫ কোটি মানুষের মাতৃভাষা ভোজপুরি, এবং প্রায় ৯ কোটি মানুষের মাতৃভাষা রাজ্যগুলির ৬১টি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে পড়ে। এই বিষয়টি তাঁর 'Language, the Opening Move' শীর্ষক প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন People's Linguistic Survey of India-র চেয়ারপার্সন এবং সমাজকর্মী গণেশ দেবী। স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখেছেন,

> The Hindi' is probably spoken by not more than 30% of the population, but it is not the mother tongue for the remaining 70%. Knowingly causing risk to any indigenous language has been described by the UNESCO as 'an act amounting to genocide'. I will use the term 'phonocide' to describe the expansionist aspirations in the name of nationalism. The aspirations are not to be attributed to the speakers of Hindi, but to the politics of the pseudo-nationalists who have no patience with the cultural diversity of India, so sensitively enshrined in the Constitution.[৫]

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল খসড়া নিয়ে বিস্তর জলঘোলার পর তা পাল্টানো হয় কিছুদিনের মধ্যেই (ওই পরিবর্তিত খসড়াটিই এখন মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়)। বর্তমান বক্তব্য,

> In keeping with the principle of flexibility, students who wish to change one or more of the three languages they are studying may do so in Grade 6 or Grade 7, so long as they are able to still demonstrate proficiency in three languages (one language at the literature level) in their modular Board Examinations some time during secondary school.

এখানে সরাসরি হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার কথা না বলা থাকলেও সেই তিনটি ভাষা শেখার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। পরিষ্কার করে এও বলে দেওয়া হয়নি, যে তিনটি ভাষা কী কী হতে পারে। শুধু বলা আছে ইংরেজি এবং দুটি ভারতীয় ভাষার কথা। পরিকাঠামোর কথা মাথায় রাখলে বোঝা যাবে, এতে অস্পষ্টতা এবং ধোঁয়াশা বাড়ল বই কমল না। আমাদের রাজ্য

পশ্চিমবঙ্গেই চোখ রাখলে দেখা যাবে, তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিই পড়ানো হয়ে থাকে সচরাচর। এখন, একজন স্কুলপড়ুয়া স্বেচ্ছায় হিন্দি শিখতে না চাইলে? উত্তর নেই। কারণ খাতায় কলমে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার কথা না বলা থাকলেও বর্তমান পরিকাঠামোয় অন্য কোনো অপশনই যে নেই! রাষ্ট্র ভালোমতোই বোঝে এ ব্যাপারটি। বোঝে বলেই আর সরাসরি কোনো মন্তব্য রাখে না, কেননা ভারতবর্ষের শিক্ষা পরিকাঠামোয় তিনটি ভাষা পড়ানোর নীতি অবলম্বন মানে বকলমে সেই হিন্দিকেই চাপিয়ে দেওয়া। এতে সুবিধাও বেশি, কেননা সমাজের একটি বড় অংশের মানুষ সরকারের এই 'উদারতা'-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন, কারণ তাঁরা সমাজের অন্তর্গত হয়েও বিচরণ করেন কল্পলোকে।

প্রশ্ন উঠবে, তাহলে সমাধান কী? অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, জাতীয় ভাষা না হলেও হিন্দি কি নানা ভাষা নানা মতের দেশে একটি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হতে পারেনা? এই তর্কের মীমাংসা করতে গেলে আগে বুঝতে হবে, হিন্দি ভাষাটি প্রধানত উত্তর ভারতের উপর নিজের আধিপত্য কায়েম করেছে মৈথিলী, অওধি, ইত্যাদি ভাষাগুলিকে মুছে দিয়ে। ভারতবর্ষ নানা ভাষা নানা মতের দেশ বলেই দেশের বিপুল পরিমাণ মানুষের ইচ্ছা এবং মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলপূর্বক একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (যদি আদৌ ভারতকে তা বলা যায়) শেষ কথা বলবে মানুষ। সুতরাং মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে মানুষেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে দেশ-সংক্রান্ত নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা যারা জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় মানুষের উপর, তারা মানবতার শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু। হিন্দি চাপানো হবে কি হবে না, তর্কটি আদৌ তা নিয়ে হওয়া উচিতই না। তর্ক হওয়া উচিত, সংযোগ স্থাপনের ভাষা, অর্থাৎ লিঙ্ক-ল্যাঙ্গুয়েজ কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা নিয়ে। সেটি ইংরেজি হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এবং সুবিধাজনকও। বাস্তব জীবনে সাভারকর, গোলওয়ালকর এবং শ্যামাপ্রসাদের অনুগামীরা আমাকে এর জন্য কলোনিয়ালিজমের দাস বলতেই পারেন। একই কথা বলতে পারেন কিছু তথাকথিত 'প্রগতিশীল' কমরেডও। ইংরেজি ভাষা শিখলেই পূর্বতন বৃটিশ শাসকের দালাল বা সর্বহারার প্রতি ঘৃণাসর্বস্ব বুর্জোয়া, এই দাবী যাঁরা তোলেন, তাঁরা সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, রাসবিহারী বসু এবং আরও অগুনতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কী বলবেন, যাঁরা বৃটিশের ভাষা শিখেই বৃটিশকে যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন? কী চোখেই বা দেখবেন ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরকে, যিনি না থাকলে গোটা দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ আজও পড়ে থাকতো সামাজিক পরাধীনতার নিকষ অন্ধকারে? এগুলি স্রেফ কুতর্ক, এবং কুযুক্তি। 'যুক্তি' হিসেবে এইগুলিকে প্রদর্শন করার মাধ্যমে একটি বৃহত্তর সামাজিক সত্য লুকিয়ে রাখার কাজ সারা হয়, যে সত্য আরেক অসাম্যের কথা বলে। আসলে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষাকে কিছু শ্রেণীর কুক্ষিগত সম্পত্তি করে রাখা হয়েছে, যে শ্রেণীগুলি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। অথচ বাস্তব হল, ইংরেজি ভাষা শেখা সহজ, অন্যান্য আর সকল ভাষার মতোই নিজস্ব সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ, এবং সবথেকে বড় কথা, আন্তর্জাতিক স্তরে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের এক (সবথেকে?) সুযোগ্য মাধ্যম। আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলেও ইংরেজি ভাষার উপর দখল থাকা প্রয়োজন। এখন দেশের বেশিরভাগ গরিব-নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের ভরসা বলতে সরকারি স্কুল, সেখানে শিক্ষাদানের মাধ্যম হল হিন্দী, বা কোনো

আঞ্চলিক ভাষা। ইংরেজি সেখানে শুধুই একটি পাঠ্যক্রমের বিষয়। দেশের শিক্ষানীতিও দাবি করছে, ছাত্রছাত্রীদের তিনটি ভাষা শিখতেই হবে স্কুলস্তরে, যার মধ্যে থাকবে দুটি ভারতীয় ভাষা। স্বাভাবিকভাবেই ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ ভার বহন করা কষ্টসাধ্য। সুতরাং ঘাটতি থেকে যাবে শুধু ভাষাশিক্ষায় নয়, বরং সমগ্র শিক্ষালাভের প্রক্রিয়াটিতেই। তার উপর দেশের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার ভাঙাচোরা পরিকাঠামো তো আছেই, যা পতনকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সর্বদা সহায়ক। অন্যদিকে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, হয়ে স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করবে। সময়ের সাথে সাথে প্রকটতর হবে এই বৈপরীত্য।

বস্তুত, ইংরেজি শিক্ষাকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে শোষিত শ্রেণীর আয়ত্তের বাইরে রেখে দেওয়াটা নতুন কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারও ক্ষমতায় থাকাকালীন এই কাজটিই করে এসেছে এতকাল। যে কারণে ত্রিপুরার মত রাজ্যে আদিবাসীরা মোট জনসংখ্যার ৩৪% হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে থেকে একজন পলিটব্যুরো সদস্যও খুঁজে পাওয়া যায় না। খেয়াল রাখতে হবে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করা মানে কোনোমতেই একজন ছাত্রী বা ছাত্রের মাতৃভাষার উপর আঘাত হানা নয়। দ্য ওয়্যারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ঠিক সেই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট লেখক, সমাজকর্মী ও ভারতের বর্ণবাদ ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচন করা তাত্ত্বিকদের একজন, কাঞ্চা ইলাইয়াহ্[৬]। তিনি বলেছেন সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে স্কুলগুলির শিক্ষা পরিকাঠামোয় সাম্য আনার কথা, মূলত ইংরেজি এবং একটি আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে ভাষাশিক্ষার ব্যাবস্থাটিকে গড়ে তোলার কথা। ওনার বক্তব্যের সাথে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যোগ করতে চাই, সবটুকু পরিষ্কার করে তোলার তাগিদে। গণেশ দেবীর যে প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেখানে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে, দুই বিদগ্ধ ব্যক্তি কি একই বিষয়ের উপর পরস্পরবিরোধী মন্তব্য রেখে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছেন? মর্মোদ্ধার আপনাদের হাতে। তবে আমি বলব, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান আর ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান, দুটি কিন্তু এক নয়। ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান মানে এই নয়, যে বেসরকারি স্কুলগুলির মত অনর্গল ইংরেজি বলে যাওয়াকেই স্কুলের মধ্যে মান্যতা দেওয়া হবে, মাতৃভাষায় কথা বললে শাস্তি দেওয়া হবে। বরং মাতৃভাষায় কথা বলাকে গুরুত্ব দেওয়া হোক আরও বেশি করে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছেলেমেয়েদের সাথে আলোচনা করুন তাদের মাতৃভাষাতেই। কিন্তু পড়ানোর মাধ্যম, বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে, হোক ইংরেজি। বিষয়ভিত্তিক শব্দচয়নে থাকুক ইংরেজি, আর মাতৃভাষা হোক শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে ছাত্রছাত্রীদের বোঝাপড়া গড়ে তোলার মাধ্যম, বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের বোঝানোর সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাথে মুক্তমনে আলোচনা করুন তাদের মাতৃভাষায়, আলোচনার মাঝেই সেই বিষয়ের অন্তর্গত টার্মগুলি প্রকাশিত হোক ইংরেজিতে। সবটাই মাতৃভাষা, বা সবটাই ইংরেজি করলে বিপদ, প্রথম ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় মানিয়ে নিতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করবে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার মন থেকে মুছে যাবে মাতৃভাষার প্রতি টান, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বোঝার মধ্যেও থেকে যাবে ঘাটতি। সাথে তিনটির জায়গায় স্কুলস্তরে দুটি ভাষা পড়ানো হলে ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপও কম পড়বে। ইংরেজি সেক্ষেত্রে কাজ করবে নানা ভাষা নানা মতের দেশ

ভারতবর্ষের বহুকাঙ্খিত লিঙ্ক-ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতের প্রজন্ম হয়ে উঠবে বিশ্বপৃথিবীর যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই বক্তব্যের যথেষ্ট যৌক্তিক সারবত্তা আছে। কিন্তু রয়েছে সরকারি সদিচ্ছার অভাব। বা আরও সঠিকভাবে বললে, বর্ণবাদ ও বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে চাওয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের ছলাকলা।

প্রবন্ধটিতে ইতি টানব এবার। শেষ করার আগে কয়েকটি বিষয়ের উপর জোর দেব আবারও। রাষ্ট্রনীতি বুঝতে গেলে বিষয়টির মধ্যে থাকা প্রতিটি আলোচনার বিন্দুগুলিকেই খুঁটিয়ে পড়া এবং বোঝা আবশ্যক। তার সাথে আবশ্যক দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা রাখা। শুধুমাত্র নিজের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়া কোনো কাজের কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষানীতিতে স্নাতকস্তরে চার বছরের কোর্সের ব্যাপারটি যদি দেখি, তবে মনে হতেই পারে এর ফলে বিজ্ঞানে গবেষণা করতে ইচ্ছুক একটি মেয়ে বা ছেলের বেশ লাভ হবে, কেননা সেক্ষেত্রে মার্কিন মুলুকে পিএইচডি করতে যাওয়া তার পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠছে, মাস্টার্সের জন্য আরও দু'বছর এদেশে পড়ে থাকতে হচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভুললে চলবে না, আমরা বাস করি ভারতবর্ষে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী, যারা স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করে, তারা গবেষণামুখী নয়, বাধ্যত চাকরিমুখী। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ বিদেশে গবেষণা করতে যাওয়ার মত আর্থসামাজিক সুরক্ষা দেশে খুব কম মানুষেরই আছে। এই ছাত্রছাত্রীরা চার বছরের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়তে ইচ্ছুক নাই থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে দুই কি তিন বছর পর তাদের অপশন থাকছে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরিয়ে আসার। স্বাভাবিকভাবেই, নামের পাশে ডিগ্রি না থাকার দরুণ কর্পোরেটদের পক্ষে এমন ছেলেমেয়েদের শোষণ করাটা সুবিধাজনক হবে। ইতিপূর্বে ডিগ্রি থাকায় তাদের জন্য যে বেতন ধার্য হচ্ছিল, তা কমিয়ে দেওয়া হবে স্বাভাবিকভাবেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা সাদরে বরণযোগ্য, তা দেশের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষেই ক্ষতিকারক। কাজেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবিশ্বাস করাটা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর সর্বপ্রথম কর্তব্য। সাম্য আনার কথা হোক, ভারতীয় সমাজের বর্ণবাদী পিতৃতন্ত্রের সঠিক চিত্রটি তুলে ধরা হোক স্কুলশিক্ষার মাধ্যমে, উঠে আসুক স্কুলস্তরে বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষার কথা, আধুনিক ও পুরাতন সব ধরণের কুসংস্কারমুক্ত দেশ গড়ে তোলার কথা, স্কুলে-কলেজের প্রাঙ্গন মুখরিত হোক লিঙ্গ-সংবেদনশীল সমাজের দাবীতে, ছাত্রছাত্রীদের সাথে সমানতালে গলা মেলান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বদল প্রয়োজন, তার সাথে এটাও বোঝা প্রয়োজন যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কোনো দিক দিয়েই সেই কাঙ্খিত বদল নয়। দেশের শিক্ষাব্যাবস্থা এমনিতেই আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত, নয়া শিক্ষানীতি বস্তুত সেই ধ্বংসস্তুপের উপরই আরও একবার, ওই কি যেন বলে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক।

কৃতজ্ঞতা

এই লেখাটি প্রস্তুত করতে সাহায্য করার জন্য আমি ঈশান সাঁতরা এবং দেবাশিস লাহার কাছে কৃতজ্ঞ।

---

[১] https://www.thehindu.com/news/national/indias-manual-scavenging-problem/article30834545.ece

[7] http://bit.ly/2LBLbFX

[6] https://feminisminindia.com/2020/03/09/why-sex-sexuality-education-indian-schools-taboo/

[8] https://www.bloombergquint.com/politics/fewer-children-out-of-school-but-basic-skills-stay-out-of-reach-new-study

[9] https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/language-the-opening-move/article27586506.ece

[5] https://thewire.in/education/english-medium-schools-new-education-policy